মা

মাকে নিয়ে নির্বাচিত গল্প

সম্পাদনা
সজল আহমেদ

মা : মাকে নিয়ে নির্বাচিত গল্প
সম্পাদনা : সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৫০০ টাকা

Maa: Maake Niea Nirbachito Golpo edited by Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: March 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97683-9-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মাকে

ভূমিকা

মাতৃত্ব
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

> শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয়, তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটেই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন।
>
> 'শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ

মার কোলে মানুষের জন্ম, এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এতবড় স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জন করতে হয়নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে, বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হতো না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে, সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপগ্রহণ করে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত, এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে—সে কে? এমনটা পারে কে? এ শক্তি আছে কার? সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

সূচিপত্র

মা • অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৯
বুড়ি ও গাঙের ওপার • অমর মিত্র ২০
মা • আবুল ফজল ২৮
স্মৃতি • আহমাদ মোস্তফা কামাল ৩০
একটা রোদের গল্প • আহমেদ খান হীরক ৩৬
মাতৃভক্তির পুরস্কার • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৮
গোফাগুন • কুলদা রায় ৪০
অনন্যাকাহিনি • জয়দীপ দে ৪৪
বালকের চন্দ্রযান • জাকির তালুকদার ৪৭
মা-র সঙ্গে ট্রেনে • দীপেন ভট্টাচার্য ৬০
মাকে খুঁজছি, আর খুঁজছি • নলিনী বেরা ৬৫
জনক জননী • পূরবী বসু ৬৮
বিরজুর মা • বনফুল ৭৪
বুধোর মায়ের মৃত্যু • বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯
জননী • বিমল কর ৯১
রাত যখন খান খান হয়ে যায়... • মনি হায়দার ১০৩
মাকে আর মনে পড়ে না • মোজাফ্‌ফর হোসেন ১১১
মা'কে দেখা • শওকত আলি ১১৭
জননী • শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৩০
মা! আমার মা! • ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ১৩৯

ডাকাতের মা • সতীনাথ ভাদুড়ী ১৫০
শহীদের মা • সমরেশ বসু ১৫৭
মাতৃকা • সমরেশ মজুমদার ১৭৪
মা • সরদার জয়েন উদ্‌দীন ১৮৮
পাখির মা • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬
মিথ্যা মা • সুবোধ ঘোষ ২১১
মা-জননী • সৈয়দ মুজতবা আলী ২১৮
জননী • হাসান আজিজুল হক ২২৮

অনুবাদ গল্প

আমার মা, কাচের আড়ালে • ফারিবা ভাফি ২৩৫
অনুবাদ : ফজল হাসান

মা

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

জ্বর যখন আসে তখন বেশ লাগে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা হালকা নেশার মতো ম্যাজমেজে ঝিম ধরা ভাব। কোমরে, হাতে, পায়ের গাঁটে গাঁটে একটা মৃদু আরামপ্রদ কামড়ানোর অনুভূতি। প্রতিদিনের জীবনের একঘেয়ে রুটিন থেকে হঠাৎ যেন কোনো দৈব নির্দেশে পুরোপুরি ছুটি পেয়ে নবাবি আলস্যে বিছানায় চুপচাপ পড়ে থাকা। শীতকাল হলে তো আরও ভালো। জ্বর আসার সময় চেনা একটু শীত শীত ভাব শরীরে। পুবদিকের জানালার পাশে খাট পাতা। শীতের সকালের সোনালি রোদ্দুরের ওম ঢুকছে সেই জানালা দিয়ে। লাল লেপের ওপর রোদ পড়ে মনে হচ্ছে যেন লেপটা আগুনের শিখার মতো জ্বলছে। অল্প শীত শীত ভাব নিয়ে রোদে উষ্ণ সেই লাল লেপের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া যেন স্বর্গসুখের সমান। কোলবালিশটা কোলে জড়িয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করার কী সুখকর একটা অনুভূতি। মনে হয় নরম তোশক-বিছানা বালিশ যেন আমার শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে দিচ্ছে। কিন্তু এ অনুভূতি সাময়িক। এর পর জ্বর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলে একটা কষ্টের অনুভূতি শুরু হতে থাকে। আর তখনই আমার মা-র কথা মনে পড়ত। মা আসবে। এখনই আসবে। সকালের এই সোনালি রোদের মতো মা-ও এসে দাঁড়াবে আমার বিছানার কাছে। সমস্ত শরীরের গাঁটে গাঁটে হাত বুলিয়ে দেবে আমার। সব যন্ত্রণা আমার আরাম হয়ে যাবে। মা আমার কাছে আসবে বলেই জ্বর হলে খুব ভালো লাগত আমার। এমনিতে তো মা সংসারের হাজার কাজ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত। সারাক্ষণই তো রান্নাঘর, উঠোন, কলপাড়, ভাঁড়ারঘরে চরকিবাজির মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। মা তখন যেন অন্য কোনো মানুষ—আমার কেউ নয়। যখন অসুখে পড়ি তখনই মা শুধু আমার মা।

মা-র গায়ের একটা গন্ধ পেতাম আমি—তা হলো, জিরে, হলুদ, মরিচের গন্ধ। মশলা ধোয়া হাত মা শাড়ির আঁচলে মুছতেন বলে শাড়ির আঁচলটা হলুদ হয়ে থাকত আর তা থেকে ওই গন্ধ বেরোত। কিন্তু জ্বরের সময় ওই হলুদ-জিরে-লঙ্কার গন্ধটা মোটেই ভালো লাগত না। জ্বরের সময় অরুচি মুখে। রান্না করা জিনিসের গন্ধ নাকে গেলেই কেমন বমি বমি লাগে। হলুদ মাখানো শাড়ি পরে মা আমার কাছে এলেই আমি হাত-পা ছুড়ে কান্নাকাটি করতাম—না, ওই শাড়িটা পরে তুমি কক্ষনো আসবে না আমার কাছে।

হাতে সাবুর বাটি নিয়ে মা বলতেন—সংসারের হাজারটা কাজ এখন আমার—তোমার এইসব উটকো বায়নাক্কায় কান দিলে এখন আমার চলে?

—না, না, আমি কক্ষনো সাবু খাব না তুমি শাড়ি পালটে না এলে।

আমার বুড়ি ঠাকুমা নিভাননী দেবী জানালার কাছে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে আমাদের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু কৌতুকের হাসি।

—কী বউমা? ছেলে কী বলে? মা-র অবস্থা দেখে খুব মজা পেয়েছে এমনই গোপন হাসি ঠাকুমার চোখে-মুখে। খুব উপভোগ করছে মা-র করুণ অবস্থাটা।

—দেখুন তো মা, আমার এখন মরবার সময় নেই। আপনার ছেলের অফিসের ভাত দিতে হবে। মাছের ঝোলই এখনও চাপানো হয়নি। রান্না কখন শেষ হবে ঠিক নেই। এখন এসব পাগলামিতে কান দিলে আমার চলে?

—কী করবে বলো মা—পেটের ছেলে বলে কথা। ঠাকুমা যে ঠোঁট টিপে হাসছেন সেটা আমি বেশ বুঝতে পারতাম।

মা অগত্যা পরনের হলুদের দাগধরা শাড়ি ছেড়ে আলনায় পাট করে রাখা একটা নীল বা কমলা রঙের শাড়ি গায়ে চাপিয়ে সাবুর বাটি হাতে নিয়ে আসতেন আমার কাছে, কিন্তু আমার পছন্দ হতো না ওসব শাড়ি। ওসব পাটভাঙা শাড়ি পরলে মা-কে আমার মা বলে মনে হয় না—মা যেন আর সবাইকার মা।

আমি সাবুর বাটিতে দু-হাতের ঠ্যালা দিয়ে বলতাম খাব না, আমি কক্ষনো খাব না এই সাবু, তুমি ওই বিচ্ছিরি শাড়ি পরে এসেছ কেন আমার সামনে? তোমার আর ভালো শাড়ি নেই বুঝি?

মা এবার রাগে প্রায় গর্জন করে বলতেন—তোমার বেশি বায়নাক্কা হয়েছে না? অসভ্য ছেলে কোথাকার? রানির মতো সেজে আসতে হবে তোমার কাছে না, কোন রাজপুত্তুর তুমি শুনি? সংসারে আমার আর কোনো কাজ নেই না? তোমার অত ফরমাশ আমি খাটতে পারব না বলে দিলাম। খেতে হয় খাবে না হয় এই রইল। ঠক করে সাবুর বাটিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে রাগে গজগজ করে চলে যেতেন মা।

খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। যদিও দুধ-সাবু মোটেই সুখাদ্য নয়, তবুও মনে হচ্ছে ওই অখাদ্য পেটে পড়লেও এখন বাঁচি। পেটের ওই জ্বলুনিটা তো অন্তত খানিকক্ষণের জন্য নেভে! কিন্তু না, কিছুতেই আমি খাব না। কেন খাব? আমার কাছে মা যখন আসবে—একটু সুন্দর সেজেগুজে আসতে পারে না কেন? আমি কি ফেলনা নাকি? সবার কাছে যেরকম আসবে মা আমার কাছেও সেভাবেই আসবে? দুধ-সাবু পড়ে থাকত টেবিলে। আমি ছুঁয়ে দেখতাম না বাটিটা। আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখতাম মা রান্নাঘরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দে মাছ ভাজতে ভাজতে মাঝে-মাঝে আড়চোখে একবার দেখছেন আমাকে আর দেখছেন টেবিলে পড়ে থাকা দুধ-সাবুর বাটিটা। আমাদের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে বুঝতাম আর এই যুদ্ধে শেষ অবধি আমার

জিত অবধারিত জেনেই বোধহয় আমি পেটটা দু-হাতে চেপে ধরে চুপচাপ পড়ে থাকতাম।

মাছ ভাজা হয়ে গেছে। ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দটা আর নেই—আমি চুপচাপ বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছি আর মনে মনে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ শুনি কানের কাছে শব্দ—কোন শাড়িটা পরব বল!

আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠত। যুদ্ধজয়ের আনন্দ। মা শেষ অবধি হেরে গেছে আমার কাছে। মা-র সাধ্য নেই আমার সঙ্গে যুদ্ধে জেতে। আমার ইয়াহু বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে-সব কিছু না করে আমি মা-র দিকে ফিরে খুব শান্তভাবে বললাম—বাক্সের মধ্যে তোমার ঘিয়ে রঙের একটা লালপেড়ে শাড়ি আছে না? ওই শাড়িটা পরে এসো তুমি। ওটা পরলে তোমাকে খুব মানায়।

আসলে ওটা আমি মাকে পরতে বললাম দুটো কারণে—প্রথমত ওটা পরলে মাকে খুব মা-মা লাগে। দ্বিতীয় কারণ—আমি জানি মা ওই বাক্সে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখেন। ন্যাপথলিনের কেমন একটা ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ। ওটা যেন আসলে মায়ের বুকের ভিতরকার গন্ধ। এ-কথাটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। ন্যাপথলিনের গন্ধটা তাদের কাছে শুধুমাত্র ন্যাপথলিনেরই গন্ধ, কিন্তু ওই গন্ধের সঙ্গে যে আমার মা মিশে আছে তা শুধু আমিই জানি।

মা বিরক্ত হয়ে বলতেন—ওই গরদের শাড়ি আমি ন্যাপথলিন দিয়ে বাক্সে তুলে রেখেছি ওটা পরে সামনের বার পুজোয় প্রতিমা বরণ করব বলে আর ওটার এখন ভাঁজ ভাঙতে হবে তোমাকে দুধ-সাবু খাওয়ানোর জন্য? যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন দেখে মা অনুনয়ের সুরে বলতেন, 'তা ওটা পরে এলে তুমি দুধ-সাবু খাবে তো?'

আমি খুব গম্ভীর গলায় বলতাম—আগে পরে এসোই না তুমি।

ঠাকুমা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি দেখতেন আমাদের এই রঙ্গলীলা। ঠাকুমার চোখ দুটো খালি গোপনে হাসতেই থাকত—যে হাসি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।

ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে মা নালিশের সুরে বলতেন—দেখেছেন মা, আপনার নাতির কাণ্ড! মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে মারার এ কী আশ্চর্য ব্যারাম বলুন তো! এত বড় ছেলে হয়েছে, একটু কিছু যদি না বোঝে।

ঠাকুমা চোখের কোণে তির্যক কৌতুকের ছটা ছড়িয়ে টেনে টেনে সুর দিয়ে বলতেন—কী করবে বলো মা। হাজার হোক পেটের ছেলে। দুধ-সাবু তো খাওয়াতেই হবে। না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরে যাবে তা তো আর হয় না। তোমার বদনাম তাতে।

ঠাকুমার গলায় হালকা রঙের ছোঁয়াটা মা-র কান এড়াত না নিশ্চয়ই। আমার ওপর রাগটা যেন মা ঠাকুমার ওপর দিয়ে চালাতে চাইতেন। মা ঝংকার দিয়ে

বলতেন—আপনারা ওরকম হাসবেন না তো মা—আপনাদের আদরে আদরে আমার ছেলে এরকম গোল্লায় গেছে। বিয়ে-থা হবে না এই ছেলের? তখন তো বউটাকে নাকাল করে মারবে।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন—ঠিক আছে, গরদের শাড়ি পরে আসছি আমি, কিন্তু ওই দুধ-সাবু সবটা গিলতে হবে বলে দিলাম। মাকে দৌড় করে মারাবার এই শাস্তি।

আমি সে-কথায় কান না দিয়ে বলতাম ন্যাপথলিনের গন্ধ থাকে মা যেন শাড়িতে।

কিছুক্ষণ পর মা আগের শাড়ি পালটে গায়ে গরদের শাড়ি জড়িয়ে আসতেন। আমি চোখ বুজে পড়ে থাকতাম। মা কাছে এলে ডাকলেই হঠাৎ তখনই চোখ খুলে মাকে দেখব। অন্ধকার, বন্ধ ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে হঠাৎ যেমন বাইরের আলো ঘরে ঢুকে ঘর আলোময় হয়ে যায়, তেমনি হঠাৎ দেখব মা-র রূপের আলোয় ঘর আলোয় ভরে গেছে। আর সে মা তো আমারই মা।

—নে, উঠে খেয়ে নে দুধ-সাবুটা।

মা-র ডাকে বালিশ থেকে মুখ উঠিয়েই আমার ভীষণভাবে আশাভঙ্গ হয়। মাকে এই রূপে আমি দেখতে চেয়েছিলাম? আমার কথামতো মা আগের শাড়িটা পালটে ঘিয়ে রঙের তসরের শাড়িটা পরে এসেছে বটে—ন্যাপথলিনের মৃদু গন্ধও ভেসে আসছে বাক্সভাঙা শাড়িটা থেকে—কিন্তু মা-র চোখমুখের চেহারা এরকম কেন? সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছে বাবার অফিসের খাবার তৈরি করে দেবে বলে—বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি—তার ক্লান্তি চোখে-মুখে, আমার অসুখের জন্য দুশ্চিন্তায় বোধ হয় তার এই বিপর্যস্ত চোখ-মুখের অন্য একটা কারণ—মাথায় ভালো করে একটু চিরুনিও চালিয়ে আসেননি মা। উশকোখুশকো চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। আমার কিংবা বাবার একটু শরীর খারাপ হলেই মা কীরকম দুশ্চিন্তা করতে থাকেন তা আমি জানি।

ঠাকুমা মাঝে মাঝে বলেন—বউমা, সামান্য বিষয়ে অত উদ্বিগ্ন হলে কি চলে? মাঝে মাঝে মানুষের একটু-আধটু শরীর খারাপ তো করতেই পারে। শরীর খারাপ হওয়াটা তো শরীরেরই ধর্ম। শরীর তো শরীরের ধর্ম পালন করবেই।

মা বলতেন—তা আর কী করব মা, মনের ধর্মও তো মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া—ধরে নিন মনের ধর্ম মন পালন করছে।

বুঝতাম মার এই সমান-সমান জবাবে ঠাকুমা একটুও অখুশি হচ্ছেন না, পরাস্তও মনে করছেন না নিজেকে, বরং খুশিই হয়েছেন নাতি এবং নিজের ছেলের প্রতি পরের মেয়ের এই দুশ্চিন্তা দেখে।

আমি মার দিকে পিছন ফিরে বললাম—না, আমি ওই বিচ্ছিরি দুধ-সাবু কক্ষনো খাব না। আমার বমি পায়।

মা বলেন—এই যে বললি সেজেগুজে এলে তুই দুধ-সাবু খাবি!

বললাম—কই? তুমি সেজেগুজে এসেছ বুঝি? এই তো, গরদের শাড়ি পরেছ শুধু একটা, কিন্তু মাথায় চিরুনি দাওনি। কই, স্নান করে কী সুন্দর তুমি লাল সিঁদুরের ফোঁটা দাও কপালে। কই, এখন কেন দাওনি—

মা চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ঠাকুমার দিকে ফিরে বলতেন—আপনি দেখছেন তো মা, দেখছেন তো—বলুন তো এর পর আর মাথা ঠিক রাখা যায়?

আমি বুঝতাম না, আমি অন্যায় কী করেছি? কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা না পরলে মা-কে যে কিছুতেই মা-মা লাগে না তা আমি কী করে অন্যকে বোঝাব?

সব রাগ, জেদ জলাঞ্জলি দিয়ে কিছুক্ষণ পর মা এসে হাজির আমার সামনে। ঘিয়ে রঙের তসরের শাড়ি পরনে—কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা—চুল কী পরিপাটি করে আঁচড়ানো—সমস্ত শরীর থেকে ন্যাপথলিনের কী সুন্দর ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ। মনে হয় মা যেন অনেকদিনের পুরনো কোনো মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। মাঝে মাঝে মার্বেল খেলার জন্য যখন খুড়পি দিয়ে মাটি খুঁড়ে পিটু বানাতাম তখন ঘাস মাটির গন্ধ পেতাম ওরকম। ঘাসের মোটা গোড়া খুড়পির ঘায়ে কেটে গিয়ে যখন ভিতরের সাদা মাংস ফুটে বেরোত তখন যেরকম মিষ্টি একটা গন্ধ আসত নাকে—মায়ের গায়ের গন্ধটাও আমি সেরকমই পেতাম। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলাম।

মা আমার পিঠে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বললেন—নে, এবার দুধ-সাবুটা খেয়ে নে।

আমি এবার উঠে দুধ-সাবুটা খেয়ে নিতাম। কী বিচ্ছিরি খেতে। ইচ্ছে হতো জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিই। কিন্তু মা খুব সেজেগুজে এসেছে, মায়ের গায়ের মা-মা গন্ধ পাচ্ছি এখন আমার দুধ-সাবু খেতে দারুণ কষ্ট হলেও খেতে আপত্তি নেই।

আমি চকচক করে দুধ-সাবু খাচ্ছি—মা আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলতেন—এত যে মা-মা করিস, আমি তো চিরকাল আর এরকম থাকব না রে। আমিও বুড়ো হব, মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে—দাঁত পরে ফোকলা হয়ে যাবে। তখন তুই—

আমার শুনে প্রায় কান্না পেয়ে যেত। মাকে জড়িয়ে ধরে বলতাম—না, না। তুমি কক্ষনো বুড়ো হবে না, কক্ষনো না।

ঠাকুমা হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন তো পড়ছেনই—নয় তো মহাভারতের পাতার খুদে খুদে অক্ষর।

ঠাকুমা খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বলতেন মাকে—বউমা, তুমি বুড়ো হওয়ার আগে ছেলেকে একটা লাল টুকটুকে বউ এনে দিও—দেখো, ছেলে তাতেই খুশি হবে। তোমার চুল পাকলেও আমার দাদুর সে কথা তখন আর মনে থাকবে না। রাঙা বউ পেলে সব কথা ভুলে যাবে।

ঠাকুমা কেমন মজার হাসি হাসত। আমার তখন কত বয়েস, কত ছোট তা মনে পড়ে না, কিন্তু এ-কথা মনে পড়ে ঠাকুমার কথায় আমি মার কোমর আরও জোরে জড়িয়ে ধরে মার কোলের আরও ভিতরে মুখ গুঁজে বলতাম—না, আমার বউ হবে না। মা, তুমিই আমার বউ।

ঠাকুমা শুধু মজা করতে ভালোবাসতেন। মজা পেলে ঠাকুমা আর কিছু চান না। ঠাকুমা খবরের কাগজ ফেলে হো হো করে হেসে উঠতেন।

—এম্ মা মা—শোনো শোনো ছেলের কথা শোনো—এ ছেলের কী হবে?

মা-ও খুব হাসতেন। হেসে আমার গালে ঠোনা মেরে বলতেন—তুই একটা আস্ত পাগল রে! তোর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না কখনো?

মা কেন আমাকে পাগল বলছে তাও ওই বয়সে আমি বুঝতাম না। মা কেন বউ হতে পারবে না! ওই তো পাশের বাড়ি বিয়ে হয়ে এসেছে জিতুকাকুর বউ—আমার নতুন কাকিমা, ওর চেয়ে কি মা কম সুন্দর?

একদিন শুনি অনেক রাতে বাবা মাকে বলছেন—নান্টুকে আমি খুব হিংসে করি জানো?

মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিলেন—সে কী গো? এই তো নান্টু-নান্টু করে পাগল তুমি। অফিসে যাওয়ার আগে নান্টু কই গেল—অফিস থেকে ফিরে এসে—নান্টুকে দেখছি না কেন? ভাত খেতে বসে নান্টু ঘুমিয়ে পড়ল কেন? এরকম ছেলেপাগল বাবা এ তল্লাটে আছে নাকি একজনও?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন—তবুও আমি নান্টুকে খুব হিংসে করি।

মা-র হাসি আর থামেই না, যেন খুব মজার কথা বলেছেন বাবা। মা বললেন—শুনি, কেন তোমার এত হিংসে ছেলেকে।

বাবা কেমন ছেলেমানুষের মতো গলায় বলেন—ছেলে একটু বায়না করলেই অমনি কী সুন্দর তুমি সেজেগুজে চোখে কাজল কপালে টিপ দিয়ে তসরের শাড়ি পরে ছেলের কাছে চলে আসো। অথচ আমি বললে তো কিছুতেই শোনো না। সেই হলুদ লাগা শাড়ি, গায়ে শুকনো লঙ্কার গন্ধ।

মা হেসে বলতেন—ছেলেকে তো দুধ-সাবু খাওয়ানোর জন্য ওরকম পরতে হয়। তুমিও দুধ-সাবু খাওয়ার সময় বায়না ধোরো—পরে আসব। কবে ভাত ছেড়ে দুধ-সাবু ধরেছ গো?

বলেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে মায়ের খিলখিল করে সে কী হাসি!

আমার প্রথমে মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। মা তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমাকে—বাবার চেয়েও বেশি। আমি কোনো কিছু নিয়ে বায়না ধরলে তো মা কিছুতেই বায়না না মিটিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু এখন জানলাম তা শুধু আমাকে ওই বিচ্ছিরি দুধ-সাবু গেলাবার জন্যই। খুব রাগ হলো আমার আর তীব্র অভিমান। রাতে শোওয়ার সময় মা আমাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে আমি ছিটকে একপাশে সরে

গিয়ে কান্নাভরা গলায় বললাম—আমি সব জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না, শুধু বিচ্ছিরি বার্লি আর দুধ-সাবু খাওয়ানোর জন্য তুমি সেজেগুজে আসো। আমার কথা শুনে কোথায় মা দুঃখ পাবে তা না, হো হো করে হেসে উঠল, যেন আমার দুঃখ পাওয়াটা খুব মজার জিনিস মা-র কাছে। মা জোর করে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে, গালে চুমু খেতে খেতে বললেন—ও! এই জন্য খোকার রাগ হয়েছে—পাগল একেবারে পাগল—তারপর ফিসফিস করে আমার কানে কানে বললেন—যা বলেছি তা সত্যি নাকি? ও তো বলেছি তোর বাবা যাতে রাগ না করে। বাবা বড্ড বাজে না? বড্ড হিংসুটে। ইস্, এইটুকু ছোট্ট ছেলে, একে কেউ হিংসা করতে পারে? আবার হিংসে করুক তোর বাবা তোকে, দ্যাখ না কী করি। বলেই আবার খিলখিল হাসি আর আমার শরীরে চুমুর পর চুমু। মা-র শরীর থেকে আমি আবার সেই মা-মা গন্ধটা পাই। সেটা মাটির না ঘাসের না পুকুরের ঠাণ্ডা ঝাঁঝির গন্ধ ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু সে গন্ধটা আমি আর কোথাও পাই না।

২.

যে কথা বলছিলাম সে কথায় ফিরে আসি। রুমা মা-র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—মাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আর যেও না ও-ঘরে। একটু ঘুমোক মা।

রুমা কাল সারারাত মা-র শিয়রে জেগেছে। রাতে মা-র জ্বর খুব বেড়েছিল। সারারাত ধরে জলপট্টি দিয়েছে মা-র মাথায়। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ খাইয়েছে। সারারাত জাগার ফলে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল রুমাকে। চুল এলোমেলো। চোখের কোণে রাত জাগার কালি, কিন্তু মুখে কোনো বিরক্তির ছাপ ছিল না। বরং ঠোঁটের কোণে শুক্লপক্ষের শেষ রাতের জ্যোৎস্নার মতো একটু ক্ষীণ মৃদু হাসি। যেরকম হাসি রুমার ঠোঁটে সবসময় লেগেই থাকে। অসুস্থ মাকে ঘুম পাড়াতে পেরেই বোধহয় রুমা মনে মনে খুব খুশি। একটু হেসে বলে—বুঝলে তো মা-র খোকা, মাকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি। মা-র ঘুম ভাঙিয়ে কিন্তু বিরক্ত করবে না মাকে।

মা এই বয়সেও একটু থেকে একটু কিছু হলেই খোকা খোকা বলে আমাকে বিরক্ত করে বলেই বোধহয় রুমা ঠাট্টা করে আমাকে সম্বোধন করে 'মা-র খোকা' বলে। রুমার কোনো রাখঢাক নেই। মা-র সামনেই ও এই নামে ডাকে আমাকে আর মিটিমিটি হাসে। রুমার এই রসিকতায় মা কিন্তু একটুও রাগ করেন না, বরং শরৎ সকালের রোদের মতো একটু ঝিলিক হাসি হেসে বলতেন—তা তুমিও তো মা একদিন খোকার মা হবে—তখন বুঝবে মা-র খোকা কী?

রুমা একটু লজ্জা পেয়ে হেসে সরে যেত। তা রুমার কোনো কথাতেই মা রাগ করতে পারেন না তা আমি জানি। কেননা, রুমাকে বউ হিসেবে পছন্দ করে এনেছিলেন তো মা-ই। ঠাকুমা তখন মারা গেছেন। আমার রাঙা টুকটুকে বউ দেখার জন্য আর বেঁচে নেই। আমারই বরং কিছুটা আপত্তি ছিল। ঠোঁট উলটে বলেছিলাম—

'না মা, ও তো দেখতে তোমার মতো মোটেই নয়। আমার বউকে কিন্তু তোমার মতো হতে হবে।'

আমি মনে মনে ভাবছিলাম ওর গা থেকে কি আর মা-র মতো মাটি আর পুকুরের ঝাঁঝি শ্যাওলার গন্ধ উঠে আসবে যা শুঁকলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে?

মুখে বললাম—ও তো কেমন চঞ্চল ছটফটে পাখির মতো। মনে হয় যেন এখনই লেজ নাচিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। ধ্যুৎ, ওই মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।

মা বললেন—দুর পাগল! পাখিরা কত ভালোবাসে তাদের শাবকদের জানিস? মানুষের চেয়ে তারা ভালোবাসায় কম নাকি? পাখিই যদি হয় তোর বউ সে তো ভালোই।

তা মা-র কথাই রইল। পাখির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কতযুগ আগের কথা যেন সেসব।

এখানে বলে রাখি বিয়ের কিছু দিন আগে থেকেই মাকে আমি খুকি বলে ডাকতে শুরু করেছি। মা আমাকে ডাকতেন খোকা বলে। সংসারের আর সমাজের নানা কারণে আমার মনটা যখন খুব খারাপ হয়ে যেত—বই পড়ে, টিভি দেখে, খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে যে মন-খারাপি কিছুতেই দূর করা যেত না, তখন আমি সোজা চলে যেতাম মা-র কাছে।

বলতাম—খুকি, একটু পাশ ফিরে শোও তো। তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।

মা পাশ ফিরে আমার চুলে হাত বুলিয়ে বলতেন—কী রে? আবার মন খারাপ হয়েছে বুঝি। আচ্ছা, আমি চলে গেলে তোর কী হবে রে?

আমার মন খারাপ হয়ে যেত শুনে। এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। আমি চুপ করে পড়ে থেকে শুধু মাটি আর ঝাঁঝির গন্ধ নিতাম, ঘাস আর পুকুরের জলের।

মা বলতেন—দাঁড়া, খুব ভালো দেখে একটা বউ এনে দেব তোকে। তখন আর মন খারাপ হবে না তোর।

বিয়ের পর আমার আর মা-র এই ধরনের কথাবার্তা শুনে রুমা মিটিমিটি হাসত আর একটু ফাঁক পেলেই আমাকে বলত—কী গো মা-র খোকা, খোকাই রয়ে যাবে চিরদিন? বড় আর হবে না কখনো?

আমি রাগ করে বলতাম—না, আমি চাই না বড় হতে।

আমি মা-র খোকা হয়েই থাকতে চাই।

রুমা খিলখিল হেসে বলত—আহা রে, একটা ফিডিং বোতল এনে দেব নাকি?

রুমা এসব কথা বেশ মজা করে আগে মা-র আড়ালে-আবডালে বলত। এখন মজা করে সব মা-র সামনেই বলে। মা কিন্তু একটুও রাগ করেন না। মাকে আমি অবশ্য কখনো রাগ করতে দেখিনি। তার গায়ে সব সময়ে ঠাণ্ডা পানাপুকুরের ভেজা ভেজা গন্ধ। মা হেসে কপট রাগের ভঙ্গিতে বলতেন—আমার খোকা আমার খোকা, তাতে তোমার চোখ টাটাচ্ছে কেন বাপু?

রুমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলত—আর তো কিছু নয়, আপনি চলে গেলে কী হবে তাই ভাবি।

আমার কানে গেলে আমি রুমাকে ধমক দিয়ে বলতাম—কক্ষনো আর এ কথা বলবে না বলে দিলাম। কক্ষনো না। আমার খুকি চিরদিন বেঁচে থাকবে—চিরদিন।

মা বলতেন—রাগ করিস কেন বউমার ওপরে? বউমা তো ঠিক কথাই বলেছে। যতই খুকি বলে বয়স কমাবার চেষ্টা করিস আমার, চিরকাল তো আর সত্যি বাঁচব না আমি। যা, কতক্ষণ বসে থাকবি দুজনে একজন রুগির বিছানার কাছে? ঘুরে আয় দুজনে বাইরে থেকে—ভালো নাকি সিনেমা এসেছে সামনের হলে। যা দুজনে মিলে দেখে আয়। বউমা, তুমি ওই লাল পাড়ওয়ালা তসরের শাড়িটা পোরো। ওটাতে তোমাকে খুব ভালো দেখায়।

আমি কোনো কথা বললাম না। রুমা তো আর জানে না যে মাকে এই পোশাকেই আমি দেখতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম তা মা-র চেয়ে ভালো আর কে জানে? মা কি সেজন্যই ওটা পরতে বলল রুমাকে!

৩.

সারারাত জেগে মাকে সেবা-শুশ্রূষা করে রুমার চোখ একটু জড়িয়ে এসেছিল ঘুমে। আমি মাকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না। রুমা দিনরাত সেবা করে মাকে। ডাক্তার বলেছে মাকে যথাসম্ভব বিশ্রাম নিতে। রুমা মার ঘরটাকে যেন রীতিমতো একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেলেছে। যখন-তখন সে ঘরে ঢুকলেই রাগ করে রুমা। যেন ভিজিটিং আওয়ারের মতো একেবারে নির্দিষ্ট সময় মেনেই ঢুকতে হবে সে-ঘরে।

রুমা এখন ঘুমিয়েছে। এই তো সুযোগ মা-র ঘরে ঢোকার। আমি ঘরে ঢুকে দেখি মা-র ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু চুপ করে শুয়ে আছে বিছানায় ছাতের দিকে আধবোজা চোখ মেলে।

আমি মা-র গাল টিপে দিয়ে বললাম—কেমন আছ খুকি? উঃ, তোমার বউমা ডাক্তারের চেয়েও বেশি কড়া, তোমার ঘুম নষ্ট হবে বলে তোমার ঘরে আমাকে ঢুকতেই দেয় না। আসলে বড্ড হিংসুটে—সে তুমি যাই বলো!

মা ভুরু পাকিয়ে বলতেন—খবরদার, বউমার নামে কিছু বললে তুই মার খাবি আমার হাতে।

মা পুকুরের জলের মতো শান্ত, ঠাণ্ডা। কোনোদিনও সত্যিকারের রাগতে দেখিনি মাকে। আমার গায়ে হাতও তোলেননি কোনোদিনও, কিন্তু আজ মনে হলো, ইস্ সত্যি যদি মা মারতে পারত আমাকে। শরীরের সেই শক্তি যদি সত্যি কেউ ফিরিয়ে দিতে পারত মাকে?

আমি তাকিয়ে ছিলাম মায়ের দিকে। কয়েক মাসের একটা অদ্ভুত অসুখ, যা ডাক্তাররা ধরতেই পারছে না। হঠাৎ কেমন যেন কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে

মা-র। মাথার চুল পেকে গেছে সব। গাল ভেঙে গেছে। ফিটফাট লাল সিঁদুরপরা সেই মাকে আর চেনাই যায় না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

মা বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই খুব মৃদু হেসে বললেন—কী দেখছিস রে খোকা, আমি বুড়ি হয়ে গেছি না রে?

সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমি মা-র গাল টিপে দিয়ে হো হো করে হেসে বললাম—ও মা! বুড়ি হবে কোন দুঃখে? তুমি তো দিন দিন আরও খুকি হয়ে উঠছ। আরও মিষ্টি।

বলতে বলতে আমার বুকের ভেতরটা কেমন হা হা করে উঠল—ভাঙা দরদালানের মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যেমন শব্দ করে ওঠে। আমার জীবনে মা থাকবে না? সত্যি একদিন মা বলে কেউ থাকবে না? সেই দিন আসন্ন প্রায়? মা বোধহয় আমার কথার উত্তরে কী বলতে যাবে, তার আগেই হনহন করে ঘরে ঢুকল রুমা।

—এ কী, এই সময়ে তুমি মা-র ঘরে ঢুকেছ? ডাক্তার বারণ করেছে না, যতক্ষণ ঘুমাবে মা-র ঘুম না ভাঙাতে? বিশ্রাম ওর শরীরের পক্ষে সবচেয়ে বেশি দরকার। জানো না তুমি? যাও, এক্ষুনি বেরোও ঘর থেকে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—আমি ওঁর ঘুম ভাঙাইনি রুমা। বিশ্বাস করো। মা-র ঘুম আপনা থেকেই ভেঙে গিয়েছিল।

রুমা আমার কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে দরজার দিকে দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে বলল—কোনো কথা নয় মা-র খোকা। আগে তুমি ঘর থেকে বেরোও।

মা মিনমিন করে বললেন—না, বিশ্বাস করো বউমা, খোকা আমার ঘুম ভাঙায়নি।

রুমা মাকে ধমক দিয়ে বলল—আপনি চুপ করুন তো! খোকার পাল্লায় পড়ে আপনিও দেখছি খুকি হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বলেনি আপনাকে আরও বেশি করে ঘুমোতে—শরীরের শক্তিক্ষয় যত কম হয়!

আমাকে ঘর থেকে একেবারে ঠেলে বের করে দিয়ে রুমা মাকে বলে—আপনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন তো দেখি। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি আপনার। আপনি ঘুমান।

মা কাতর স্বরে বলেন—কাল সারারাত তো তুমি ঘুমোওনি। এখন একটু বিশ্রাম করো যাও।

রুমা ধমকের গলায় বলে—সেটা আমি বুঝব। আপনি এবার ঘুমোন তো।

মা অসহায়ের মতো বলেন—আজ আমার আর ঘুম আসবে না বউমা।

—ঠিক আসবে। আমি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্প বলব। দেখবেন ঠিক ঘুম এসে যাবে।

এবার মা হেসে বললেন—তা তুমি সত্যি পারো বউমা, তোমার অসাধ্য কিছু নেই।

রুমা বলে—অসাধ্য হবে কেন? আপনার ছেলের খুকি আপনি। তাহলে তো আমারও খুকি। নাও, পাশ ফিরে শোও দেখি খুকি। কোন গল্প শুনবে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি না লালকমল নীলকমল?

আমাদের বিয়ের সময়কার সেই ফাজিল চঞ্চল পাখির ভাবটা এখনও যায়নি রুমার। আমার দেখাদেখি মা-র সঙ্গে এরকম ফাজলামি রুমাও করে।

কোন মায়া মন্ত্রে মাকে ঘুম পাড়িয়ে ঘণ্টা খানেক পরই মা-র ঘরের দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে রুমা। তার চোখ-মুখে স্পষ্ট তৃপ্তির ছাপ। মাকে সে আবার ঘুম পাড়াতে পেরেছে। ডাক্তার বলেছে মা-র রোগ অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এখন কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

ঈষৎ ক্লান্তি যেকোনো মানুষকেই একটা আলাদা সৌন্দর্য দান করে। রুমার ক্লান্তির জন্য রুমাকেও কেমন অন্য মানুষের মতো মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—রুমা, মা-র খোকা বলে তো সবসময় ঠাট্টা করো আমাকে। আমি নাকি কোনোদিনও বড় হব না। কিন্তু মা-র খোকার এই মা-টিকে তো কত যত্নেই তুমিই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছ—তোমার তাতে তো একটুও ক্লান্তি নেই। এই ব্যাপারটা তো আমি বুঝতে পারি না।

রুমা রহস্যময় হাসি হেসে বলল—বুঝবে কী করে মা-র খোকা? আগে বড় হও তবে তো বুঝবে?

আমি বললাম—না রুমা, সত্যি বলো না—

রুমা হঠাৎ কেমন আশ্চর্য টলটলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—মা যেদিন সত্যি চলে যাবেন, সেদিন সত্যি অনেকটা বড় হয়ে যাবে তুমি—বুড়ো হয়ে যাবে। আমি তা জানি। বুড়ো বর আর কে চায় বলো? বেঁচে থাক তোমার মা, চিরজীবন বেঁচে থাক। খোকাই থাকো তুমি সারা জীবন।

আমি স্পষ্ট বুঝলাম মুখের ঘাম মোছার অছিলায় রুমা চোখের জল মুছে নিল। আমি হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম রুমাকে দেখতে অবিকল আমার মা-র মতো লাগছে। কিন্তু কেন, বলতে পারব না।

হঠাৎ সমস্ত ঘর যেন ভরে গেল মায়ের গায়ের সেই সবুজ ঘাস, সোঁদা সোঁদা মাটি, আর ঝাঁঝি শ্যাওলার গন্ধে। সমস্ত শরীর আমার শিরশির করছে।

আমি বুঝলাম মা যদি চলেও যান তবু মা-র মৃত্যু নেই। মা নিঃশব্দে তার গন্ধ রেখে যাবেন সব কিছুতে। সে গন্ধটা লোপাট করার মতো শক্তি পৃথিবীর কারও নেই।

বুড়ি ও গাঙের ওপার

অমর মিত্র

বুড়ির বগলে পুঁটুলি। বুড়ি যাবে সুন্দরপুর। সুন্দরপুর কোথায়, না গাঙের ওপারে। গাঙটি মস্ত বড়। ওপার দেখা যায় ছায়া ছায়া। গাছ, কুটির, মাঠ, নৌকো এই সব। বুড়ি যাবে তার মেয়ের বাড়ি। মেয়ের বাড়ি অনেক দূর, গাঙ পেরিয়ে সুন্দরপুর। মেয়ে চিঠি দিয়েছে, মা, তুমি তো কোনোদিন এলে না, এসে দেখে যাও আমাদের গাঁ। আমার সংসার। ফল আছে, আম-কাঁঠালের বাগান আছে, পুকুর আছে, সেই পুকুরে মাছ আছে, গোয়াল আছে, গাই বাছুরের ডাক আছে, মাঠ আছে, মাঠের ওপর হাওয়া আছে। হাওয়া উঠলে তোমার কথা খুব মনে পড়ে। সব আমার মা। ভিটে থেকে গরু-বাছুর, আগান-বাগান, পান-সুপুরি, সব আমার। বুড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনেক কাল। কতকাল তা বুড়ির স্মরণে নেই। তখন মেয়ের বাবা বেঁচে ছিল, তার বাড়িতেও আম-কাঁঠালের বাগান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, গাই-বাছুরের ডাক ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল, আর কী ছিল মনে নেই। সব বেচে খেয়েছে মেয়ের বাপ আর তার ছেলে। চিঠি নিয়ে এসেছিল সাইকেলে টিং টিং বাজিয়ে ডাকপিয়ন। লম্বা, রোগা, নাকের নিচে মাছি গোঁফ, ধুতি আর খাকি শার্ট। এসে হাঁক মেরেছিল, গুরুবারি দাসী বলে কেউ আছে?

বুড়ি তখন দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। ভাবছিল আর মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার বাড়িতে নেই কেউ। পুকুর নেই, বাগান নেই, গাই নেই, বাছুর নেই, নেই বলে তার চিন্তা নেই। আগলে রাখার কিছু নেই। দিনে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেয়, সঙ্গে আলু বেগুন সেদ্ধ। নুন আর কয়েক ফোঁটা তেল। একবেলা ভাত আর অন্যবেলা চিড়ে-মুড়ি যা হয়। গুরুবারি দাসী তার নাম বটে, ভুলেই গেছিল একেবারে। সিড়িঙ্গে মাছি গোঁফ লোকটির কথায় তার মনে পড়ল। গুরুবারি মানে বেস্পতি বা বৃহস্পতি। বিস্যুতবারে জন্ম তাই তার নাম রেখেছিল মা-বাবা। বাবার নাম মঙ্গলদাস বিশ্বাস, মায়ের নাম সোমবারি বিশ্বাস। বুড়ির স্বামীর নাম, তা বুড়ি বলবে না। কেন বলবে না, তাতে নাকি অকল্যাণ হয়। অকল্যাণ আর হবে কী, তিনি তো গত হয়েছেন, মেয়ে পুঁটুর বাবা চন্দ্রদাস হেতাল।

—ডাকপিয়ন বলল, গুরুবারি কে?

—আমি তো জানি আমার নাম গুরুবারি ছিল। বুড়ি বলেছিল।